প্রভাস সেন

চিত্ত প্রসাদ, কিছু স্মৃতিচারণ

চিত্ত প্রসাদের বন্ধু শিল্পী প্রভাস সেন। সোমনাথ হোর-এর প্রথম দীক্ষাগুরু চিত্ত প্রসাদ। প্রভাস সেন এবং সোমনাথ হোর দুই বর্ষীয়ান শিল্পীর চোখে চিত্ত প্রসাদ মানুষটি কেমন ছিলেন, তাঁর শিল্পের বৈশিষ্ট্য এবং শক্তির ক্ষেত্রই বা কোথায়— আমরা জানতে চেয়েছিলাম।

শিল্পী চিত্তপ্রসাদকে যখন আমি প্রথম দেখি আমার হঠাৎ নন্দলাল বসুর সুপ্রসিদ্ধ বিশ্রামরত অর্জুনের রেখাচিত্রটি মনে পড়েছিল। শক্ত, ঋজু, উজ্জ্বল চেহারা। নাক, চোখ মুখ যেন কুঁদে তৈরি। প্রতিভায় উজ্জ্বল অনমনীয় ব্যক্তিত্বের আধার। মেদহীন পেশল ছিপছিপে শরীরে চওড়া বুক আর সরু কোমর। চলাফেরা, নড়াচড়ায় বন্য সৌষ্ঠব। একশতটি আকর্ষক ব্যক্তিত্বের মানুষের ভিতর প্রথম চোখে পড়বার মতো লোক।

চিত্ত প্রসাদ ছিলেন দৃঢ় আদর্শের মানুষ। তাঁর নিজস্ব আদর্শ ও জীবন দর্শনে একনিষ্ঠ থাকবার জন্য সারা জীবন কৃচ্ছ্রসাধন করতে বা একদা প্রিয় বন্ধু বা সহকর্মীদের পরিত্যাগ করতে তিনি পশ্চাৎপদ হননি। শিল্পচর্চায় তিনি ছিলেন একলব্যের মতো। শিল্পী নন্দলালের কাছে শিক্ষা লাভে প্রত্যাখ্যাত হয়ে অন্য কারো কাছে তিনি শিল্পশিক্ষা লাভের জন্য যাননি। আমাকে বলেছিলেন যে নন্দলালের শিল্পশৈলীর বোধ ও সাম্যবাদী আন্দোলনের আদর্শকে নির্ভর করে তিনি তাঁর নিজস্ব শিল্পশৈলী গড়ে নিতে পেরেছিলেন এবং ১৯৪৩/৪৪ সালে যশস্বী ও প্রতিষ্ঠিত শিল্পী হিসাবে নন্দলালের আশীর্বাদ ও অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভে সমর্থ হয়েছিলেন।

যতদূর জানি চট্টগ্রামের ছাত্র আন্দোলনের পোস্টার আঁকা ও হাতে লেখা পত্রিকায় ছবি ইত্যাদির সূত্রে তিনি চারের দশকের পূর্বেই চট্টগ্রামের স্থানীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন এবং ক্রমে তৎকালীন অবিভক্ত সি. পি. আই.-এর সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশির আগ্রহে আই. পি. টি-এ আন্দোলনে যোগ দেন। এবং অল্প ক'বছরের মধ্যেই ভারতীয় কম্যুনিস্ট আন্দোলনের শৈল্পিক অভিব্যক্তির প্রধান শিল্পী হিসাবে খ্যাত হন। ক্রমে প্রখ্যাত শিল্পী সোমনাথ হোর ও বহুমুখী যশস্বী শিল্পী

খালেদ চৌধুরীও* সাম্যবাদী আন্দোলনের সূত্রে চিত্তপ্রসাদের সংসর্গে আসেন তাঁদের নবীন বয়সে। এবং যতদূর জানি এই দুই বহুজন শ্রদ্ধেয় শিল্পীর প্রথম সামান্য কিছু আনুষ্ঠানিক শিল্প প্রশিক্ষণ চিত্ত প্রসাদের কাছেই হয়েছিল। সোমনাথ হোর মশাই অবশ্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ হবার পরও বোধহয় শিল্পের গ্রাফিক আর্টের টেক্‌নিকাল দিকগুলি ভাল করে বোঝবার জন্য কলকাতা আর্ট স্কুলেও কিছুদিন পাঠ নিয়েছিলেন। ঠিক মনে নেই, আমার সঙ্গে শিল্পী চিত্ত প্রসাদের পরিচয় ১৯৪৫ বা ৪৬ সালে। যতদূর মনে পড়ে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন প্রখ্যাত আলোক চিত্র শিল্পী সুনীল জানা। বোম্বাই শহরে। চিত্ত প্রসাদও তখন ভারত বিখ্যাত শিল্পী। কম্যুনিস্ট পত্র-পত্রিকায় সর্বদা প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর জোরালো হাতের সাদা-কালো ড্রইং, লিনোকাট্ কার্টুন। ড্রইং-এর বলিষ্ঠতায় আর তার ভিতর দিয়ে দেশের নানা বর্গের মানুষ জন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে নিজস্ব প্রত্যয়ে, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে, অত্যাচারিত মানুষের প্রতি ড্রইং বা লিনোকাটের লাইনে লাইনে ভালবাসার অভিব্যক্তিতে তাঁর শিল্পকর্ম তখন এক আশ্চর্য জগতের সৃষ্টি করে চলেছে। সারা ভারতের শুধু সাম্যবাদীরাই নয় অন্য বুদ্ধিজীবীরাও চিত্ত প্রসাদের শিল্পকর্মের সাগ্রহ প্রতীক্ষা করতেন সপ্তাহের পর সপ্তাহ।

চিত্ত প্রসাদ গ্রাম-ভারতকে বিশেষ ভালবেসেছিলেন এবং গ্রামের শিশু ও মা, কর্মঠ কৃষক, ভূমিহীন চাষী শ্রমিকদের জীবনের সংগ্রাম তিনি তাঁর শিল্প মাধ্যমে মমতা-মাখা যত্নে ও ক্রোধে প্রকাশ করেছেন।

দেশের নানা অংশে কৃষক সম্মেলনগুলিতে সে-সময় কৃষকেরা তাঁদের সর্বভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের মতোই চিত্ত প্রসাদকে দেখবার জন্য প্রতীক্ষা করে থাকতেন। একবার মহারাষ্ট্রের কোথায় এক কৃষক সম্মেলনে ছবি আঁকতে গিয়ে শিল্পী তাঁদের হাতে আটক হয়ে গেলেন। প্রায় মাস দুয়েক ধরে গ্রামের পর গ্রামের দরিদ্র কৃষকেরা তাঁকে ভালবাসার বন্ধনে বেঁধে সমস্ত দক্ষিণ-পশ্চিম মহারাষ্ট্র ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন।

আমার সঙ্গে চিত্ত প্রসাদের যখন পরিচয় হয়, তিনি থাকতেন বোম্বাইয়ের উপনগরী আন্ধেরীতে। স্টেশন থেকে ৮/১০ মিনিটের হাঁটা পথের শেষে সেকালের খোলামেলা পরিবেশে বড় হাতাওয়ালা একটি পুরনো একতলা বাড়ির একটি ঘরে। শুনেছি বিয়াল্লিশের আন্দোলনে পশ্চিম ভারতের এক জঙ্গী নায়ক পৃথিসিং বাড়িটির মালিক বা ভাড়াটে ছিলেন।

---

*খালেদ চৌধুরীকে আমরা চিত্ত প্রসাদ সম্পর্কে লিখতে অনুরোধ করেছিলাম। শেষাবধি তাঁর লেখা পাইনি। সাক্ষাৎকার দিতে চেয়েছিলেন। —সম্পাদক।

চিত্তকে তিনি ভালবাসতেন এবং ঐ ঘরটি তাঁকে স্বল্প ভাড়ায় থাকতে দিয়ে ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে চিত্ত প্রসাদকে তাঁর বোন কলকাতায় নিয়ে আসবার আগে পর্যন্ত তিনি ঐ বাড়িতেই ছিলেন।

১৯৪৮ সালে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির কলকাতা কংগ্রেসে ভারতের কম্যুনিস্ট আন্দোলনে ভাঙনের সূত্রপাত হয়। পি. সি. যোশি পার্টি সম্পাদকের পদ থেকে বিতাড়িত ও পার্টি থেকে সাস্‌পেন্ডেড হন। বোম্বাইতে বি. টি. রণদিভে কলকাতা কংগ্রেস সম্বন্ধে পার্টি সদস্যদের গোপন বৈঠকে রিপোর্টিং করেন। চিত্ত প্রসাদ রিপোর্টটি মেনে নিতে পারলেন না এবং নিজেকে পার্টির কাজ থেকে সরিয়ে নিলেন এবং পার্টির কাছ থেকে ভাতা নেওয়াও বন্ধ করলেন। পার্টির ভাতা দিয়ে দুবেলা ডাল আর রুটি খাওয়া চলত তার বেশি নয়। বোধহয় চল্লিশ টাকা ভাতা পেতেন (তা থেকেও ১০ টাকা বাড়ি ভাড়া বাদ)। এই টাকায় এর বেশি খাওয়া সম্ভব ছিল না। এখন সেটি বন্ধ হল। শুরু হল উপবাসের পালা যা জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবন যাত্রার সঙ্গী ছিল মোটামুটি। চিত্ত প্রসাদের মতো প্রতিভাবান শিল্পীর জীবনসঙ্গী উপবাস কেন হবে সে প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে। প্রশ্নটির উত্তর আছে তাঁর অত্যন্ত কঠোর জীবনদর্শনের ভিতর।

১৯৪৮ সালে কম্যুনিস্ট পার্টির সংশ্রব ত্যাগের পর তাঁর কুচ্ছ্রসাধনের সংবাদ জানতে পেরে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ভিতর ও বাইরের তাঁর বহু গুণগ্রাহী তাঁর প্রতি নানা ধরনের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে সব সাহায্যের প্রস্তাব তিনি প্রায় সমস্তই সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ কোনও বিজ্ঞাপন সংস্থার কাজে মন্দকেও ভাল চিত্রিত করতে হয়। যে পার্টি ছেড়ে এসেছেন তার কর্মকর্তা বা সদস্যদের সুপারিশে আসা কোনও কাজ গ্রহণ করা নীতিবিগর্হিত মনে হয়েছিল। পয়সাওয়ালা লোকদের কাছে ছবি বিক্রি করাও অসহনীয় ছিল। বই-এর কভার ও ইলাস্ট্রেশন করবার চেষ্টা করতেন কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রকাশকেরা শিল্পীদের কম পয়সায় কাজ করাতে চেষ্টা করছে দেখতেন বা দেখতেন যে তাঁকে খাতির করে তাঁদের কর্মরত শিল্পীকে না দিয়ে কোনও প্রকাশক কাজটি তাঁকে দিতে চেষ্টা করছেন। একসময় তিনি বইয়ের কভার বা ইলাস্ট্রেশন করছেন জেনে একবার পোল্যান্ড বা চেকোশ্লোভাকিয়ার (ঠিক মনে নেই) এক প্রকাশন সংস্থা তাঁকে দিয়ে ২/৩টি বাংলা বই-এর ওদেশী অনুবাদের জন্য মলাট ও ভিতরের ছবি করিয়ে নেন। চিত্ত প্রসাদ সেগুলি করে তাঁদের দুতাবাস মারফৎ বিল সহ পাঠিয়ে দিলেন। যখন সে দেশ থেকে 'চেক্' এলো সেটি দেখে চিত্ত প্রসাদ মহা খাপ্পা! তিনি যা বিল করেছেন

তা থেকে বোধহয় দশগুণ বেশি টাকার চেক এসেছিল। চিত্ত প্রসাদ চেক ফেরত দিয়ে তাঁদের লিখলেন তিনি যে বিল করেছিলেন তার চাইতে বেশি টাকা পাঠিয়ে তাঁকে অপমান করা হয়েছে। তাঁরা ফিরে লিখলেন যে, তাঁরা তাঁদের দেশে ঐ কাজের যে অর্থমূল্য দিতেন তাই মাত্র শিল্পীকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি যেন অনুগ্রহ করে এটি গ্রহণ করেন না হলে তাঁরা সে দেশের সমাজের চোখে শিল্পীর শোষণকারী হিসাবে চিহ্নিত হবেন। শেষ পর্যন্ত চিত্ত প্রসাদকৃত বিলের টাকা মাত্র দিয়ে তাঁরা ছবিগুলি ফেরত দেওয়া থেকে রেহাই পান।

এই ঘটনার ভিতর দিয়ে দেশটির রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে চিত্ত প্রসাদের বেশ পরিচয় হয় এবং ঐ দেশের দু তিন জন শিল্পী ও সমালোচক এসে তাঁর শিল্পকর্ম দেখে মুগ্ধ হন। যতদূর জানি এঁরা চিত্ত প্রসাদের কিছু ড্রইং ও লিনো ছাপাই চিত্র ও-দেশে নিয়ে গিয়ে অনেকগুলি শহরে প্রদর্শনী করেন। সেসময় কয়েকটি সংগ্রহশালা তাঁর বেশ কিছু কাজ কিনেছিলেন এবং ও-দেশের শিল্পী সংঘ তাঁর কিছু ছবির একটি অ্যালবাম বার করেন। তাঁরা কিছু সংখ্যায় সেগুলি শিল্পীকে পাঠান এবং তাঁকে ওদেশে শিল্পী সংঘের অতিথি হিসাবে অন্তত বছর খানেক, অথবা ইচ্ছা করলে যতদিন খুশি থেকে যাবার জন্য সরকার মারফৎ নিমন্ত্রণ করেন। অ্যালবামটি চিত্ত প্রসাদ নামমাত্র মূল্যে তাঁর বন্ধু-বান্ধব মহলে বিক্রি করেন এবং আমাকে কলকাতায় একটি চিঠি লিখে ঐ নিমন্ত্রণ পেয়ে খুশি হয়েছেন জানিয়ে বলেন যে যাত্রার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও পাশপোর্ট ইত্যাদির জন্য তিনি কলকাতায় আসছেন তাতে আমাদের কিছু সাহায্যের দরকার হবে এসব ব্যবস্থার জন্য। আমি স্বাগত জানিয়ে টেলিগ্রাম করি এবং বন্ধু সুনীল জানা তাঁর স্টুডিওতে চিত্তর থাকবার ব্যবস্থা করেন।

এরপর যা হল তা থেকে মানুষ চিত্ত প্রসাদকে বুঝতে আরও সাহায্য করবে।

চিত্ত প্রসাদ কলকাতায় এলেন এবং বন্ধু-বান্ধব ও গুণগ্রাহীদের চেষ্টায় অনতিবিলম্বে অর্থাৎ মাসখানেকের ভিতর তাঁর পাশপোর্ট হয়ে গেল— সেই দেশটির দূতাবাস থেকে লোক এসে ভিসা ইত্যাদি ওদিকের যা করণীয় সব করেছিলেন। সে দেশের শিল্প আকাদামি থেকে চিঠি এল— তাঁরা জানতে চেয়েছেন শিল্পী কবে রওনা হতে চান— তাঁরা সেভাবে তাঁর সমস্ত ব্যবস্থা করবেন। দিল্লী দূতাবাসে একটি ফোন করলেই তাঁরা টিকিট পাঠিয়ে দেবেন।

এবারে শুরু হলো মুস্কিলের। আমরা চিত্তর অনুরাগীরা যখন তাঁর

বিদেশ যাত্রার অনারে একটি সম্বর্ধনার আয়োজন করতে ব্যস্ত— হঠাৎ আমি সুনীলের ফোন পেলাম— 'চিত্ত দুদিন ধরে খুব কিছু ভাবছিল,— আজ সকালে বলছে ও যাবে না— এখন বসে ওর হবু হোস্টদের চিঠি লিখছে। একবার এসো।' সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে হাজির হলাম সুনীলের স্টুডিওতে। আমায় দেখেই চিত্ত একগাল হেসে আমাকে সম্বর্ধনা জানাল,— 'এসো ভাই, একটু সেলিব্রেট করা যাক, খুব বেঁচে গেছি। দারুণ ভুল করতে যাচ্ছিলাম। ভাগ্গিস পরশুদিন হঠাৎ খেয়াল হলো।' বললাম— 'ব্যাপার কী? সুনীল কোথায়?'— 'সুনীল খুব রাগটাগ করে ডার্করুমে ঢুকে বসে আছে'— বলেই অট্টহাসি।— 'আর ব্যাপারটা হলো আমি যাচ্ছি না।' তারপর সে যা বলল তার মোদ্দা কথা হলো এই যে সে কম্যুনিস্ট পার্টি ত্যাগ করেছে মার্কসবাদে বিশ্বাস হারিয়ে নয়। সারা দুনিয়ায় কম্যুনিস্ট আন্দোলন যে চেহারা নিয়েছে সে আর তাতে বিশ্বাস করে না। এ অবিশ্বাস যে সব দেশে কম্যুনিস্ট সরকার আছে তাদের সম্পর্কে বেশি করে সত্য। যে দেশে তাঁকে আমন্ত্রণ করছে সে দেশের রাষ্ট্রশক্তি কম্যুনিস্ট এবং সেখানে শিল্পীর নিজের এই বিরুদ্ধ মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে না। এমন কি তাঁকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলেও হয় তাঁকে চুপ করে থাকতে হবে নয়ত ভাল ভাল কথা বলতে হবে। এটার অর্থ হলো নিজের সততা বিসর্জন দেওয়া। সুতরাং তিনি চিঠি লিখে ওদের জানিয়েছেন যে তিনি কম্যুনিস্ট পার্টি ত্যাগ করেছেন এবং কম্যুনিস্ট দেশগুলির সরকার সম্বন্ধে তাঁর কোনও শ্রদ্ধা বা আস্থা নেই। ওখানে কোন কিছু অন্যায় বা অব্যবস্থা দেখলে তার সমালোচনা ও প্রতিবাদ করতে ইচ্ছা হবে। কিন্তু যেহেতু তিনি অতিথি হিসাবে সে দেশে যাবেন— এ রকম কিছু করা অভদ্রতা হবে। সুতরাং নিজের সততা রক্ষার জন্য না যাওয়া স্থির করলেন।

কিছুদিনের ভেতরই মত পরিবর্তন করবার অনুরোধ সহ পত্র এল। তাঁরা বললেন যে তাঁদের সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। চিত্ত প্রসাদ ওদেশে গেলে তাঁর সর্ববিষয়ে সমালোচনা করবার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। সুতরাং তিনি যেন কোনও সঙ্কোচ না করে চলে আসেন। তিনি কম্যুনিস্ট পার্টি ত্যাগ করেছেন তাও তাঁরা জানেন। এর পর চিত্ত প্রসাদের দ্বিতীয় ও শেষ পত্র যাতে শিল্পী তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে জানালেন যে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে নিমন্ত্রণকর্তার নিন্দা বা সমালোচনা করা ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী। তিনি একজন ভারতীয়। সুতরাং তাঁর পক্ষে সমালোচনার স্বাধীনতা নিয়েও যাওয়া সম্ভব নয়।

জীবনের শেষ দশ পনেরো বৎসর ছবি আঁকার সঙ্গে কবিতা লিখেছেন।

আর অপূর্ব সব পুতুল নাচের পুতুল (স্ট্রিং পাপেট) তৈরি করেছেন। এবং তাদের নিয়ে অনবদ্য সব ছোট ছোট গল্প বেঁধেছেন। একদল ছেলেমেয়েও ছুটে গিয়েছিল যারা তাঁর কাছে পুতুলগুলি খেলানো শিখে নিয়েছিল এবং চমৎকার একটি পুতুল নাচের দলও গড়ে উঠছিল। চিত্ত প্রসাদ এই সময় বেশ অসুস্থ হয়ে পড়ায় দলটি ঠিকমতো গড়ে উঠতে পারল না আর আমরা— চিত্ত প্রসাদের প্রতিভার আর একটি দিকের পূর্ণ বিকাশের আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হলাম।

অসুস্থ অবস্থাতেই চিত্ত প্রসাদ রামায়ণ মহাভারতের গল্প নিজের মতো করে একপৃষ্ঠায় ক্যালিগ্রাফিক কলমে লিখন এবং সামনের পৃষ্ঠায় তার চিত্রীকরণের কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু তা শেষ করে যেতে পারেননি।

আমি তার কয়েকটি পৃষ্ঠা দেখেছিলাম এবং ছবি ও লেখার অসাধারণ শিল্প গুণে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

এই ছবি ও লেখাগুলি চিত্ত প্রসাদের ভগ্নী শ্রীমতী গৌরীর কাছে আছে কিনা জানি না। যদি এই মহাকাব্য দুটির যে কোনও একটির কয়েকটি কাণ্ড শিল্পী শেষ করে গিয়ে থাকেন তবে সেগুলির একটি প্রদর্শন করতে পারলে শিল্পীর ঐ কাজগুলি রসিক জনেরা দেখতে পারতেন। □